শান্তিদাদু সমগ্র

নিখাদ বাঙালি

Shantidadu Samagra
Fiction
Written by Nikhad Bangali

© Sampad Baraik
ISBN: 978-81-958566-4-0

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ: ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ণশুদ্ধি ও বিন্যাস: ঋতাক্ষর

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিশার্স
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫

মুদ্রক: লেটারব্রিক্স প্রিন্টস, কলকাতা ৭০০০৯০

মূল্য: ৪১৫ টাকা

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূচিপত্র

মায়াবী	৭
খোক্কস	১৪
শান্তিদাদু	১৯
শান্তিদাদুর খেলা	২৭
কুণ্ডলিনী	৫২
সমাহর্তা	১০৪
তপুষী	১১০
পরিষ্কন্দ	১২২
খরগোশ	১২৭
মহালয়া	১৩৭
ধূপকাঠি	১৪৪
পরিধান	১৫৪
ঘূর্ণি	১৬০
পরিষেবা	১৭১
ভগ্নাংশ	১৮২

মায়াবী

টক করে আওয়াজটা হল। পায়ের কাছে।

তাকিয়ে দেখি একটা মাঝারি মাপের ঢিল।

একটু ভয় করল। ভূতের ভয় না, চোর-ডাকাতের। আমার কাছেও কিছু পাথর মজুত করা ছিল। একটা মাঝারি দেখে পাথর নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে সাঁই করে অন্ধকারে ছুঁড়ে মারলাম। পাথরটা তিরবেগে দেওয়াল টপকে ওপারে চলে গেল।

নিজের কাজে আবার মন দিলাম। নাইট শিফটে ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন চালানো যে কী চাপের, যারা করে তারাই জানে। না... এবারে একটু জায়গাটা আর আমার কাজটা আপনাদের বুঝিয়ে দিই। খড়্গপুরের গা ঘেঁষে যে হাইওয়ে সোজা মেদিনীপুর টাউন চলে গেছে, সেই রাস্তার পাশেই একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি আমি। কেন? কীসের জন্য? সেসব সুখ দুঃখের কথা থাক আজ। ছোট করে বলি, একটি আলুর চিপ্‌স বানানোর কারখানা, আর সেখানেই শিফট ম্যানেজার আমি। নামেই ম্যানেজার, কাজে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব। মূল কারখানা থেকে অফিসবাড়িটি আলাদা। মাঝে রাস্তা। ওই কাঁচামালের গাড়ি ঘোরানোর জন্য অনেক নিয়মকানুনের ব্যাপার। সেই অফিসেই রাতে একা বসে কিছু কাজ সারছিলাম। রাতের শিফটে বেশিরভাগই সব ঘুমোয়, তবে আমি প্রোডাকশনের চাপটা দেব ভোররাতে। তখনই সবার ঘুমটা ধরে কিনা।

এইসময়ই এই অতর্কিত প্রস্তরখণ্ডের আক্রমণ। ধানক্ষেতের মাঝে কারখানা, সামনে হাইওয়ে বলেছিলাম। মাঝেমাঝেই শুনেছি আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এসে কারখানার দেওয়াল টপকে তার, পাইপ, কল, লাইট এসব চুরি করে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে বন্দুকধারী দারোয়ান। আর আছি আমরা, রাত্রিকালীন কর্মচারী। তাই চোরেরা ছোট ছোট ঢিল মেরে পরীক্ষা করে নেয় জেগে আছি কিনা। প্রত্যুত্তরে বেয়ারিং পোস্টে ঢিল না পেলে চোরেরা ধরেই নিত, এই রাতটা চুরির রাত। এতদিন শুনেছিলাম শুধু, আজ ঢিলটা এসে পায়ের কাছে লাগতে একটু ভয় করতে লাগল। বলা যায় না, দল বেঁধে রে রে করে তেড়ে এলে একা কী-ই বা করব?

তাও কাজে মন দিলাম। মিনিটখানেক বাদে আবার একটা ঢিল। ওইরকম মাঝারি মাপেরই। এবার সত্যি ভয় করল। তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে। ফোন তুলে গার্ডকে ডাকার চেষ্টা করলাম। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল। সে বোধহয় গেট অফিসে বন্দুককে কোলবালিশ বানিয়ে ঘুম দিয়েছে। নাহ, ভাবনার বিষয়। একবার ভাবলাম, কারখানার ভিতরে চলে যাই। কিন্তু বসে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কারণ কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে ওখানেই... অমনি দেখি একটা ছোট মাথা অন্ধকার থেকে উঁকি মারছে। আর সেই মায়া মাখানো অথচ জ্বলন্ত নীল চোখ। একঝলক আমায় দেখে, এবং আমি যে তাকিয়ে আছি সেটা বুঝেই বোধহয় আঁধারে মাথাটা লুকিয়ে গেল।

'সেই' চোখ বললাম যখন, তখন নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, এই মাথা ও চোখের অধিকারী বা অধিকারিণীর সঙ্গে আমার আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে। হয়েছিল, তবে সেটা সাক্ষাৎ না।

সে মাসখানেক আগের গল্প। এরকমই রাতের শিফটে কাজ করছি। অত্যন্ত সাপের উপদ্রব বলে একটা টর্চ আর লাঠি সবসময় থাকেই আমার সঙ্গে। সেই রাতে, অফিস থেকে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছি মূল কারখানার দিকে। কাচের দরজা খুলে বেরোতেই বাঁ দিকের ডাস্টবিনে একটা হুটোপুটির আওয়াজ পাই। শেয়াল ভেবে যেই না টর্চ জ্বেলে লাঠিটা মুঠো করেছি, অমনি জানোয়ারটা আমার দিকে তাকাল। বেড়ালের মতো কাটা চোখ, কিন্তু এরম অদ্ভুত মায়া মিশ্রিত নীল চোখ... আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ দুটো যেন সম্মোহন করে ফেলবে। আর ওই নীল কিন্তু স্থির না, আগুনের মতো গনগন করছে। সেকেন্ড খানেকের দেখা। কুচকুচে কালো জানোয়ারটা বোধহয় টর্চের আলো দেখে বিহ্বল হয়েছিল মুহূর্তখানেক। তারপর ডাস্টবিন থেকে নেমে ছুটল। ততক্ষণে আমিও লাঠি হাতে ছুটলাম। এ জানোয়ার ভামবিড়ালই হবে। কিন্তু আকারে বেশ বড়। দৌড়ানোর কায়দাও অদ্ভুত। সামনের পা অপেক্ষাকৃত সরু আর ছোট। পেট মাটি থেকে অনেকটা উঠে। দৌড়ে দৌড়ে, কারখানার শেষের দেওয়ালে এসে গেলাম, এবং পরমুহূর্তে আমাকে অবাক করে সেই জানোয়ার প্রায় ন'ফুটের দেওয়াল অবলীয়ায় লাফিয়ে পার হয়ে গেল। দেওয়াল ধরে চড়ল না, সটান মাটি থেকে হাই জাম্প মেরে পেরিয়ে গেল। দুটো ব্যাপারে আমাকে হতবাক হতে হল। প্রথমত, টর্চের আলোয় প্রাণীটির ল্যাজ দেখেছি। ভামের মতো ঝাঁকরা নয়, বরং সরু, মাঝারি, লম্বা। আর দ্বিতীয়ত, প্রাণীটি যে দেওয়াল টপকে গেল সেদিকে আমাদের যাওয়া মানা। কারখানার মালিক বাস্তু-টাস্তু মেনে কীসব হোম-যজ্ঞ করে জায়গাটা দেওয়াল তুলে আলাদা করে দিয়েছে। এখানকার লোকেরা বলে কীসব কোন সাধুর জায়গা ছিল। প্রত্যেক কারখানা, অফিস, আদালত সব জায়গাতেই এরকম একটা গল্প ও বিশ্বাস প্রচলিত থাকে।

যাই হোক, সেই এক মাস আগের পশ্চাৎধাবন ও লম্ফনের পরে প্রাণীটি আজ আবার উদয় হয়েছে। এবং ঢিল সেই ছুঁড়েছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ এক অদ্ভুত প্রজাতির ভামবিড়াল, এবং আজকে ঢিল ছোড়ার ঘটনায় আরো নিশ্চিত হলাম। কারণ অনেকদিন আগে ভামবিড়ালকে আমি নিজে দেখেছি মানুষের মতো সামনের থাবা দিয়ে কলার খোসা ছাড়িয়ে খেতে। কিন্তু লক্ষ করে ঢিল ছোড়া? নাহ, তাহলে তো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থাকতে হবে। আর ওকে আমিও ঢিল মেরেছি, একটু আগে, তার উত্তরে আরেকটা ঢিল মারল, তাহলে কি?

এসব ভাবনার মধ্যেই টুক করে আরেকটা জিনিস এসে পড়ল পায়ের কাছে। একটা শক্ত কষা ছোট পেয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবে জানালার বাইরে পেয়ারা গাছটার দিকে আমার চোখ গেল। ওই তো, অন্ধকারে কালো মহাশয় পেয়ারা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এর একটাই মানে হয়, এ জীব আমার ক্ষতি চায় না। এ চায় খেলতে। এবং এটি ভাম না। এটি একটি বাঁদর, একটু অদ্ভুত বাঁদর, কিন্তু যেভাবে ডাল ধরে ঝুলছে, তাতে তো বাঁদরই হবে। আমিও দিলাম পেয়ারাটা ছুঁড়ে। খেলবি আমার সঙ্গে? আয় সারা রাত পড়ে আছে আমার কাছে।

পেয়ারার ডালে কিঞ্চিত আন্দোলন হল এবং আমার দিকে একটা ডাঁশা পেয়ারা উড়ে এল। বাহ বেশ উপকারী বাঁদর তো। বেছে বেছে ভালো দেখে পেয়ারা দিয়েছে। তাও আবার এবারে একটা বাক্সর উপর ফেলেছে, যাতে ফেটে না যায়। আমার একটু মজা লাগল। এবারে আর কিছু না ছুঁড়ে, সটান টর্চ নিয়ে জ্বালিয়ে আলোটা ওর উপরে ফেললাম।

কুচকুচে কালো রঙ, বাঁদরের মতো কান নেই। আলো পড়তেই নীল চোখ একটু ছোট হল, এবং পরমুহূর্তে মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। বাঁদরের মতো দাঁত খিঁচানো হাসি নয়। মানুষের কৌতুক হলে যেরম হাসে সেরকম। এবং হাসি মুখেই আমার দিকে তাকিয়ে দুলতে লাগল সে। এবার আমার ভয় করল। এ এক অজানা জীব। আমার জ্ঞানে এরকম কোনো প্রাণী নেই যে নিজের মতে হাসতে পারে, লাফাতে পারে, মাঝরাতে খেলতে চায়। ভয় ঠিক না, কিন্তু আমি যে কী অনুভব করলাম আমিই জানি না। আশ্চর্য, অবাক, আর কিঞ্চিত ভয়— সব মিশিয়ে এক আজব পরিস্থিতি। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গার্ডকে ডেকে নিয়ে এলাম, তারপর বাকি রাত কারখানার অন্য কাজে চলে গেল।

দিনের আলো ফুটতেই মনে সাহস ফিরে এল। আলো জিনিসটা খুব আশার ওষুধ। নিজের চোখ ও মস্তিষ্ককেই সন্দেহ করতে বাধ্য করায়। তাই সাধারণভাবেই আমার মনে এই বিশ্বাস স্থির হল যে, টানা পাঁচদিন নাইট শিফট করে আমি ভামবিড়ালকেই হাসতে দেখেছি। আর ঢিল, পেয়ারা এগুলো

চোরেরাই ছুঁড়েছিল। কাউকে কিছু জানালাম না। জানালে সবাই ভাববে, স্যারের মাথাটা বিগড়েছে।

তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা। নিয়ম অনুযায়ী আবার আমার নাইট শিফট। তিনরাত কাটিয়েও ফেলেছি, এবং কোনো ভাম, বাঁদর, ঢিল, পেয়ারা কোনোকিছুরই অত্যাচার হয়নি। সেদিন বৃহস্পতিবারের রাত, চতুর্থ রাত্রি জাগরণ। সেই নিষিদ্ধ দেওয়ালের সামনে ছিল আমাদের তেলের বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক। যে তেলে চিপ্স ভাজা হয়। রাতে তেলের মাপ নিয়ে ফিরছি। হাতে যথারীতি টর্চ আর লাঠি। অনেকেই ভাববেন যে, কারখানা চলছে, বাকি লোক কই? তাদের জন্য জানিয়ে রাখি, গরমকালে যে কোনো কারখানায় রাতে গিয়ে দেখবেন, প্রায় সবাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্যাকিং-এর ঘর, বা ল্যাবরেটরি ছেড়ে নড়ে না। অন্ধকার গরমের রাতে, কার আর আমার মতো ঘুরে বেড়াবার শখ জাগে?

সেই মাপ নিয়ে ফিরছি, প্রায় অফিসের গেঁটের সামনে পৌঁছেছি, পিছন ফিরে দেখি কিছুটা দূরে, সেই দেওয়াল এর দিক থেকে একটা বেঁটে ছায়ামূর্তি হেঁটে বয়লার রুমের দিকে চলে যাচ্ছে। বয়লার তো বন্ধ, নিশ্চয়ই কোনো লেবার, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ওর পিছনে গেছে। ওই জায়গাটা নোংরার ডিপো। যত আস্তাকুঁড় আর লেবার স্থানীয় লোকেরা ওখানে পৈটিক নিষ্কাশনের কাজ সেরে আসে দিনের বেলা। বাবাহ, এদের সাপের ভয়ডরও নেই, রাতের বেলা চলল ওখানে। মানুষটা ছোট, খানিক বামনের মতো আকার, এবং সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। নিশ্চয়ই ঝাড়ুদার পবন, ও-ই ওরকম ছোটখাটো দেখতে।

এরপরেও মাসখানেক রাতের বেলা মাঝে মাঝেই দেখতাম পবনকে ওদিকে যেত। ছায়ার মতো, চুপিচুপি। তখন মাসের শেষ, সেই মাসে প্রোডাকশনের চাপও কম। বেশিরভাগ মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হচ্ছে। সব্বাইকে ডেকে সাধারণ ট্রেনিং দিচ্ছি খাদ্য সুরক্ষা, সাধারণ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে। কেউ কেউ শুনছে, কেউ কেউ শুধু তাকিয়ে শোনার ভান করছে। ট্রেনিং-এর মধ্যেই প্রসঙ্গ উঠল পরিচ্ছন্নতার, এবং আজকের দিনে মাঠেঘাটে শৌচ না করার উপকারিতার। তখন কথায় কথায় পবনের দিকে তাকিয়ে আমি বলেই ফেললাম, "এই যে মাঝরাতে তুমি পেট খালি করতে জঙ্গলে যাও, এটায় শুধু যে তোমাকে সাপ-খোপ কামড়াতে পারে তাই নয়, তোমার শরীর খারাপও হতে পারে।"

পবন হাঁ করে গ্রাম্য ভাষায় খানিক হাত-পা নেড়ে যা বোঝাল, তার মানে হয় যে, সে কোনোদিনই রাতে ওই নোংরা জায়গায় যায় না। সকলেই তখন স্বীকার করতে শুরু করল, রাতে ভয়ে কেউ ওদিকে যায় না। গ্রাম্য মানুষ সব, সন্ধে হতেই ঝোপঝাড়ে ভূত দেখে। আমি ভাবলাম, ধরা পড়ে সব মিথ্যা

বলছে।

কিন্তু ইলেক্ট্রিশিয়ান সৈকত এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, "স্যার কি ওদিকে কিছু দেখেছেন নাকি?"

বেশ রহস্যময় সুরে জিজ্ঞেস করাতে, আমার সন্দেহ হল। নিশ্চয় এ কিছু জানে।

আমি বললাম, "কে যায় বলো তো?"

উত্তরে সে আমায় প্রস্তাব দিল, "এক কাজ করুন, সামনের নাইট শিফটে আমাদের সঙ্গে থাকুন। জানিয়ে দেব কে যায়। অবশ্য এক রাতেই ধরতে পারবেন মনে হয় না।"

দেখতে দেখতে রাতের শিফট এসেও গেল। কারখানা সেদিন বন্ধ, শুধু কিছু রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, ব্যস। ইলেক্ট্রিশিয়ানদের কাজের রুম ছিল বয়লার রুমের উল্টোদিকে একটু অফিস ঘেঁষে। গিয়ে দেখি তারা এলাহি আয়োজন করেছে রাতের জন্য। মুড়ি, ভাজা পেঁয়াজ, চানাচুর, সিঙ্গারা, আলুর চপ আরো কতকিছু মেখে রাতের টিফিনের ব্যবস্থা করেছে।

আমি গিয়ে বললাম, "আজ তো ফ্যাক্টরি বন্ধ, আজ আর কাকে ধরব?"

সৈকত ও আরো তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে স্যার, একদিন এই গরিবদের সঙ্গে একটু মুড়ি ফিস্ট করে যান। কত আর কাজ করবেন?"

মহানন্দে মুড়ি সহযোগে মধ্যরাতীয় আড্ডা চলতে লাগল। রাত জাগার একটা নেশা থাকে, সেই নেশা যারা জাগেনি তারা বুঝবে না। যখন সমস্ত পৃথিবী শুয়ে পড়ে, ঝিঁঝিঁ পোকা সমানে ডেকেই চলে আর মাঝে মাঝে ওই হাইওয়ে দিয়ে লরি হু হু করে চলে যায়, তখন মনে হয় না একটা শহরের কাছে আছি।

একথা সেকথা চলছে আমাদের পাঁচজনের। পূর্ণিমার রাত, তাই লাইটগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু অফিসের লাইট জ্বলছে একটু দূরে। আমি কী একটা হাসির কথা সবে বলতে গেছি, এমন সময় রাজু আমায় হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওই দেখুন স্যার..."

তাকিয়ে দেখি সেই বামন ছায়ামূর্তি। সামনের দিকে ঝুঁকে চলছে। খুব সন্তর্পণে, এদিক ওদিক দেখে এগিয়ে আসছে। সবাই যেন নিঃশ্বাস আটকে দেখছে। চারিদিকের হাওয়া বাতাসও যেন থম মেরে মৃত্যুপুরীর মতো অপেক্ষা করছে। ব্যাপার কী? আজ তো কারখানা বন্ধ, এটা কি তবে চোর? রোজ রাতে আসে? হাঁটাটাও একটু অদ্ভুত। মানুষের মতোই অবয়ব, কিন্তু হাঁটছে ভাল্লুকের মতো।

"যখী..." ফিসফিস করে বলল সৈকত।

আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম। সে আবার কী জন্তু?

"যখী স্যার... ওটা যখী... ভূত..." সৈকত আবার বলল।

শান্তিদাদুর খেলা

।।১।।

"শয়তান? শয়তান কাকে বলে? তুই হলি শয়তান..."

শান্তিদাদুর এ হেন আমার উপর দোষারোপ শুনে আমার মনে প্রশ্ন আর অভিমান একসঙ্গে গুমরে ওঠে। দাদুর বোধহয় এবার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

দোষের মধ্যে কী করেছি? না দেওয়ালের গায়ে সেঁটে থাকা ওই হিংস্র লাল দুটো চোখের ছায়া ছায়া অবয়বটাকে আমি 'শয়তান' বলেছি।

সেবার এপ্রিল মাসে, সবে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে ঘরে বসে আছি। জয়েন্টও দিয়ে ফেলেছি। রেজাল্টের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। একবার ভাবছি রামপুরহাটে আমার মামারবাড়ি ঘুরেই আসি। তখন আমি আঠেরো, একটু বড় হয়েছি। একা একাই হাওড়া থেকে বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বা গণদেবতা এক্সপ্রেস ধরে চলে যেতে পারি। ক'দিন কাটিয়ে আসা যাবে। ভাবতে ভাবতেই শুনি দরজায় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর। খুব উঁচু গলায় কে যেন কথা বলছে। গিয়ে দেখি শান্তিদাদু। তাঁর বড়ছেলে কলকাতায় ডাক্তার, তার বাড়িতে এসেছিলেন। আজ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

শান্তিদাদুকে যারা চেনেন না, তাঁদের জানিয়ে রাখি, উনি আমার নিজের দাদু ছিলেন না। যে কোনো বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ওঁকে এড়িয়েই চলত। তার কারণ বীরভূম স্থিত ডেউচা গ্রামের কালীসাধক ছিলেন তিনি, এবং কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। কিন্তু বললেই বা কেউ চাইলেই সেই ক্ষমতার প্রদর্শন করতেন না। মুশকিলটা হত কেউ না চাইতেই, কখনো কখনো এমন কথা বলে দিতেন উনি, তখন হয়তো অত্যন্ত অপ্রিয় সত্যিটা বেরিয়ে চলে আসত, অথবা ভবিষ্যৎের ব্যাপারে চিন্তার কারণ হয়ে যেত। কে কী মনে করল, কে কী ভাবল, শান্তিদাদু এসবের ধার ধারতেন না।

যেমন, সেদিনই আমাদের বাড়িতে ঢুকেই দাদু আমার মা'কে বললেন, "তোর ওই কৌটোতে চা তলানিতে এসে ঠেকেছে। বিকেলে চিকুকে দিয়ে কিনিয়ে আনিস। আপাতত এই চা'টা বানা।" এই বলে হাত বাড়িয়ে একটা

চায়ের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। খাস ওকেইটি।

মা হতবাক। আমাদের বাড়িতে চায়ের প্রচলন কোনোকালেই অতটা নেই। অবাক শুনতে লাগলেও এটাই সত্যি। বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখতে পারি না। সত্যিই রান্নাঘরে গিয়ে মা দেখে চা প্রায় নেই। তারপর দুপুরে বাবা অফিস থেকে এসে, দাদুকে প্রণাম করার পরেই, শান্তিদাদু বাবার মাথায় হাত রেখে বলেন, "আসানসোলে যাস না। ট্রান্সফার অর্ডারের পরিবর্তে পিটিশন কর, ক্যানিং-এ পোস্টিং দিয়ে দেবে।"

দু'দিন পরে বাবার আসানসোলে যাওয়ার ট্রান্সফার অর্ডার বেরোল। আমার বাবা শান্তিদাদুকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। বলতেন, "চিকুটা যদি একদিন শান্তিদাদুর কাছে থেকে পড়াশোনা করত, ওর সারাবছরের টিউশনের জ্ঞান ওই একদিনেই হয়ে যেত..." আমার নিজের অবশ্য দাদুকে ভয় করার কারণ অন্য ছিল। সেই যে ডেউচাতে, নিজের ঘরে বসিয়ে আমাকে স্বপ্নের মতো কীসব ভূত, প্রেত, অদ্ভুত জীব আর এইজন্ম ওইজন্ম দেখিয়েছিলেন, সেই তখন থেকেই। সেই বিশেষ দিনটায় ভয় পাইনি, কিন্তু তারপরে এতগুলো বছর মাঝে মাঝেই সেইসব দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলে শিউড়ে উঠতাম। ভয়ে এসব কথা বাবা-মাকেও বলিনি কোনোদিন। হাজার হোক শান্তিদাদু আমায় বিশ্বাস করেই সেদিন আমায় সেইসব দেখিয়েছিলেন, আর আমাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়েছিলেন।

সেই শান্তিদাদুই আমাদের বাড়িতে। হয়তো এমনিই দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু আমার মন বলছিল, দাদু তো এমনি এমনি কোনো কাজ করার লোক নন। নিশ্চয়ই কিছু দরকারে এসেছেন। এবং আমার ধারণা যে নির্ভুল, সেটা বিকেলেই প্রমাণ হল। খাওয়াদাওয়া সারা হতেই আমার মা'কে বললেন, "চিকুকে নিয়ে যাই, একটু কলেজ স্ট্রিট যাব।"

অগত্যা আমি লেজুড় হয়ে চললাম। সাদা ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে হাতে ছাতা আর কাঁধে ঝোলা নিয়ে মেট্রোতে উঠলেন দাদু। সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমেই হনহন করে হেঁটে চললেন কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানগুলোর দিকে। কী কিনবেন কে জানে। ঘুরে ঘুরে এই দোকানে ওই দোকানে বই দেখলেন, একটা রুল টানা খাতা কিনলেন। তারপরে আমাকে বললেন, "চল প্যারামাউন্টে সরবত খাব।"

এই এতক্ষণে আমার মনটা বেশ চনমন করে উঠল। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে লাইন দিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে আয়েশ করে ডাবের সরবত খাচ্ছি, এমন সময়ে শান্তিদাদু চোঁ চোঁ করে পুরো গ্লাসটা শেষ করে দিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথের দিকের বইয়ের দোকানটায় দৌড়ে গেলেন। কী এমন মনে পড়ল দাদুর?

আমিও রাস্তা পেরিয়ে দাদুর কাছে গেলাম। দু'-চারটে লোক দাঁড়িয়ে

আছে। দাদু একটা কেমিস্ট্রির বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন। একটু পরে ভিড় পাতলা হয়ে শুধু আমি, শান্তিদাদু আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা কী একটা বই দেখে রেখে দিল, তারপর পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। শান্তিদাদুও মেয়েটার পিছনে পিছনে হাঁটা দিলেন। অগত্যা আমিও।

কিছুটা যাওয়ার পর শান্তিদাদু গলা তুলে ডাকলেন, "শিল্পিতা... শুনছ মা?"

মেয়েটা পিছন ফিরে তাকাল, চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। 'মা' সম্বোধনের জন্যই হোক অথবা বয়স্ক মানুষ দেখেই হোক, মেয়েটা এগিয়ে আসে।

শান্তিদাদু একগাল হেসে বলেন, "শিল্পিতা রায়, এটাই তোমার নাম তো মা?"

"আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক..." মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

আমার থেকে একটু বড়ই হবে বয়সে। সালোয়ার কামিজ পরেছে, আর লম্বা চুল একটা ফুল ফুল রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা।

"তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু আমি তোমায় চিনি..." শান্তিদাদু বলেন, "আর অনেক কিছুই জানি..."

"কী বলতে চাইছেন আপনি?" মেয়েটা সন্দিগ্ধ হয়, "কী জানেন আপনি?"

কিছু না বলে শান্তিদাদু গড়গড় করে বলতে থাকেন, "জন্ম উনিশশো আশি, তুলা রাশি, কন্যা লগ্নে, মুদিয়ালির মাতৃসদনে। পিতার নাম মাধবচন্দ্র রায়, মাতা কুহেলী রায়, আদি নিবাস বীরশিবপুর। এখানে নিবাস নিউ আলিপুরে। কলেজে পড়ো, সেকেন্ড ইয়ার, ভূগোল অনার্স। বারো বছর বয়সে জন্ডিস, পনেরোতে চিকেন পক্স..."

ঝটিতে মেয়েটা কিছুটা পিছনে সরে যায়। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, "কে আপনি? এত কিছু জানেন কী করে?"

আশেপাশের লোকে তাকিয়ে দেখে। দু'-চারজন এগিয়ে আসে। মেয়েটা বোধহয় দাদুকে কিডন্যাপার ভেবেছে। আমি প্রমাদ গুনি, এই বুঝি একটা ঝামেলা হয়। ঠ্যাঙ্গানি খেলে আমিও বাদ যাব না। কী মরতে শান্তিদাদুর সঙ্গে এলাম কে জানে?

কিন্তু হঠাৎ দাদু আকাশের দিকে মুখ তোলেন। তারপরেই মাথা নামিয়ে নেন। দাদুর চোখদুটোয় তখন মণি নেই। পুরোটাই সাদা। চাপা অথচ বজ্রগম্ভীর স্বরে শান্তিদাদু যেন গর্জে উঠলেন, "যে যার নিজের কাজে যাও, খবরদার এদিকে তাকাবে না..."

ও মা! ম্যাজিকের মতো লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। যেন তারা আমাদের দেখেইনি। মেয়েটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের পলক ফেলছে না। দাদু আবার নর্মাল হয়ে গেছেন, মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। তারপর বললেন, "এইরকমভাবেই পূর্ণেন্দু তোমার মা-বাবার আস্থা লাভ করেছে, তাই

না?"

মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি মাঝে অবাক। কে এই মেয়ে? কে-ই বা পূর্ণেন্দু? ধুর, সবসময় দাদু আমাকেই অন্ধকারে রেখে ঘটনা নিজের মতো চালিয়ে যান।

।।২।।

পুঁটিরামের আলুরদম ভেঙে মিষ্টি ছোলার ডালের সহযোগে সবে রাধাবল্লভীটা মুখে পুরেছি, শিল্পিতাদি শান্তিদাদুর হাত ধরে বলে ওঠে, "আমাকে বাঁচান দাদু, প্লিজ..."

সেই রাস্তার মাঝে দাদুর ম্যাজিক দেখার পর শিল্পিতাদি'কে শান্তিদাদু নিয়ে এসেছেন পুঁটিরামে। খেতে খেতে ঘটনা শোনা যাবে।

শিল্পিতাদি বলে, "সপ্তাহখানেক আগে এক রবিবারে, এক সাধু উদয় হন আমাদের বাড়িতে। ওই গঙ্গাসাগরের মেলা ফেরত যেমন সাধু হয় সেরকম। সামান্য চাল-ডাল ভিক্ষা চান। বাবা বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, আর মা একটা বাটিতে কিছু চাল আলু নিয়ে এসে দিতে যায়। তখন সেই সাধু অবিকল ওই একটু আগে আপনি যেমন চোখের মণি সাদা করে সবাইকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন, তেমনভাবেই গড়গড় করে আমাদের বংশের পূর্বপুরুষদের নাম বলতে শুরু করেন। মিনিটখানেক সেরকম বিড়বিড় করে একটা 'আঁ আঁ হুঁ হুঁ' করে কী একটা অদ্ভুত মন্ত্র আউড়ান আর বলেন, 'আমার নাম পূর্ণেন্দু ব্রহ্মচারী, মনে রাখিস।' তারপরে আর কিছু না বলে সটান চলে যান।"

শান্তিদাদু মাঝে বলে ওঠেন, "এই মন্ত্রটা বলেছিল? 'ওঁ তক তুমব্রী দহ দহ দরইয়া আঁ আঁ আঁ হুঁ হুঁ হুঁ হেঁ হেঁ... কোটা কমরীয়া ওঁ ঠঃ ঠঃ?'"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবিকল এই মন্ত্র..." শিল্পিতাদি প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

"হুমম..." শান্তিদাদু বলেন, "নিম্নমানের বশীকরণ মন্ত্র..."

"কিন্তু আপনি যে মন্ত্রটা এখুনি সবার সামনে এখানে বললেন, কেউ তো বশে এল না..." এবার আমি প্রশ্ন করি।

শান্তিদাদু একটু হেসে বলেন, "অত সোজা নয় রে, খালি মন্ত্রটাই শুনলি, এর আগে বিবিধ উপাচার আছে। মন্ত্র হল কেমিস্ট্রির ফর্মুলার মতো। শুধু ফর্মুলা মুখস্থ করলে কিছু হয়? সেটার অ্যাপ্লিকেশন করতে তো পিরিয়ডিক টেবিলের এলিমেন্টস বা কম্পাউন্ডগুলো লাগবে। বুঝলি?"

আমি হাঁদার মতো শুনি। শান্তিদাদুর সব কথা কোনোকালেই বুঝতাম না। তাই এবারও শুধু মাথাই নাড়লাম।

"তারপর কী হয়েছে সেটা বল মা..." দাদু জিজ্ঞেস করেন শিল্পিতাদি'কে।

"তারপরে কী বলব, বাড়িতে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে..." শিল্পিতাদি

বলে, "ঠিক ভূতুড়ে না। বাবার যেন কোনো কাজে মন নেই। আগে অফিস থেকে এসেই টিভিতে খেলা নিয়ে বসত, এখন বেশিরভাগ দিনেই ঘরে বসে থাকে। অফিসে গেলেও দুপুর বিকেলে চলে আসে। মা'ও যেন রান্নাবান্না ঘরের কাজ সবই করছে, কিন্তু কেমন অগোছালো। আগে ঘর নোংরা করে রাখি বলে বকা দিত, এখন যেন কোনোদিকেই নজর নেই। হঠাৎ করে দেখলে আপনার মনে হবে সব নর্ম্যাল, সামান্য কথা, টিভি দেখা, সংসার, সবই চলছে কিন্তু থেকে থেকে দেখি দুজনে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন কিছু দেখে যাচ্ছে। চার-পাঁচবার একই কথা বললে সাড়া দেয়। আমাদের পাড়াপড়শি সেরকম নেই। সবাই পশ, খুব দরকার ছাড়া এ ওর সঙ্গে কথা বলে না। তাই ব্যাপারটা এখনও সবাই লক্ষ করেনি।"

"আর কিছু হচ্ছে?" শান্তিদাদু জিজ্ঞেস করেন।

শিল্পিতাদি একটু কিন্তু কিন্তু করে সামনের দিকে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "বাড়িতে থাকলেই আমার খালি মনে হয় কেউ আমার দিকে সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছে। জানালার বাইরে থেকে, অ্যাটাচ বাথরুমের ভিতর থেকে বা দেওয়ালের ঘুলঘুলি থেকে। আমি খুঁজেছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি। কিন্তু সবসময় মনে হয় আমার দিকে কেউ তাকিয়ে আছে।"

"হুমম..." দাদু আবার বলেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে কী যেন ভেবে শিল্পিতাদি'র দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, "তামার পয়সাটা কই?"

শিল্পিতাদি যেন হকচকিয়ে যায়, তারপর কী ভেবে ঝট করে নিজের গলার সরু সোনার হারটা টেনে বের করে। একটা তামার পয়সা, ফুটো করে হারের সঙ্গে ঝুলছে। অনেকটা আমাকে আমার দিদা যে পয়াসাটা দিয়েছিল সেরকম। শান্তিদাদু সেটা স্পর্শ করে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেন, "এটার জন্যই ওই বশীকরণ তোমার উপর সফল হয়নি। তোমার দাদু তোমায় এটা দিয়েছিলেন, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" শিল্পিতাদি উত্তর দেয়, "দাদুর বাবা মানে আমার প্রপিতামহ নাকি সাধক ছিলেন। এক দেবী নাকি তাঁকে এই পয়সাটা দেন। আমার বাবার এসবে বিশ্বাস নেই, তাই দাদু আমাকে দেন।"

"তোর পয়সাটা কই?" শান্তিদাদু হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন।

আমি তখন সবে আমার ছ'নম্বর রাধাবল্লভীটা ছিঁড়েছি। ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিই, "বাড়িতে, মা রেখে দিয়েছে..."

"মূর্খ..." সবার সামনেই দাদু আমায় বলেন, "বলেছি না পয়সাটা নিজের কাছে রাখবি সর্বক্ষণ। দেখ এই মেয়েটাকে, কী সুন্দর রেখে দিয়েছে। আর তুই? আর বেশি রাধাবল্লভী খেতে হবে না। ওই করে পঁচিশে আলসার বাঁধাবি। ওঠো... চলো তোমাদের বাড়ি যেতে হবে..." শেষের কথাগুলো ওই দিদিটার উদ্দেশ্যে বলেই দাদু উঠে পড়েন। তখন বিকেল পাঁচটা বাজে।